Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 119 – 126
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বাংলাদেশের ছোটগল্পে সমাজ-অস্থিরতা ও দ্রোহ ভাবনা : ১৯৮০ - ১৯৯০

ড. অমিত কুমার নন্দী
SACT, বাংলা বিভাগ
ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ
ইমেইল : amitnandiju@gmail.com

Keyword
বাংলাদেশ, ছোটগল্প, সমাজ-অস্থিরতা, দ্রোহ ভাবনা, মুক্তিযুদ্ধ, রাজনীতি, স্বাধীনতা।

Abstract
১৯৪৭-এর দেশভাগের পর ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হলেও 'বাংলা' ভাষাকে আশ্রয় করে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনের মধ্যবর্তী সময়ে পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ভাষার নামে দেশ 'বাংলাদেশ' গঠিত হয়। কিন্তু "আমারে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না" ডাকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সকল মুক্তিকামী যোদ্ধারা স্বাধীনতা এনে বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল, অচিরেই তাদের সেই স্বপ্নের ঘুম ভেঙে গেল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের হত্যামৃত্যুর পর বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। বিশ শতকের আটের দশক জুড়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সেনা অভ্যুত্থান, শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও লুণ্ঠন, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। সমকালীন বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে এক শ্রেণীর লেখকগোষ্ঠী মসীর সাহায্যে এই অবক্ষয় ও যুগযন্ত্রণাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন। সেইসঙ্গে সমকালীন সময়ের নষ্টস্রোতকে তারুণ্যের দ্রোহ মাধ্যমে তাঁরা রুখে দিতে চাইলেন। সমকালীন সময়ের সমাজ-অস্থিরতা বাস্তবায়িত হতে শুরু করল ছোটগল্প নামক সংরূপের মধ্যে দিয়ে।

এই গবেষণানিবন্ধ মূলত আলোচিত হবে, বিশ শতকের আটের দশকের বাংলাদেশের বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে সমকালীন সময়ের সমাজ-অস্থিরতার চিত্র এবং সেইসঙ্গে সমকালীন ছোটগল্পকাররা কীভাবে এই অবক্ষয়, যুগযন্ত্রণার নষ্টস্রোতের বিরুদ্ধে দ্রোহমুখর হয়ে উঠেছিল তাদের লেখনীর মাধ্যমে। এই আলোচনার জন্য বিশ শতকের আটের দশকের নির্বাচিত কয়েকজন ছোটগল্পকার ও তাঁদের কয়েকটি ছোটগল্প বেছে নেওয়া হয়েছে।

Discussion

১৯৪৭-এর দেশভাগের পর ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হলেও 'বাংলা' ভাষাকে আশ্রয় করে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনের মধ্যবর্তী সময়ে পদ্মা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর ভাষার নামে দেশ 'বাংলাদেশ' গঠিত হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের "আমারে আর দাবায়ে রাখতে পারবা না" ডাকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যে সকল মুক্তিকামী যোদ্ধারা স্বাধীনতা এনে বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল, অচিরেই তাদের সেই স্বপ্নের ঘুম ভেঙে গেল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের হত্যামৃত্যুর পর বাংলাদেশে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। বিশ শতকের আটের দশক জুড়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, সেনা অভ্যুত্থান, সামরিক শাসন, শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন ও লুণ্ঠন, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলল। সমকালীন বাংলাদেশের সাহিত্য বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে দিয়ে এক শ্রেণীর লেখকগোষ্ঠী মসীর সাহায্যে এই অবক্ষয় ও যুগযন্ত্রণাকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন। সেইসঙ্গে সমকালীন সময়ের নষ্টস্রোতকে তারুণ্যের দ্রোহ মাধ্যমে তাঁরা রুখে দিতে চাইলেন। সমকালীন সময়ের সমাজ-অস্থিরতা বাস্তবায়িত হতে শুরু করল ছোটগল্পের সংরূপের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশের সাহিত্যে এই যুগযন্ত্রণা উঠে আসার পিছনে আছে ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ের ইতিহাসের চলন। অর্থাৎ ইতিহাসই মূলত চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশের সাহিত্যের। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসটি সংক্ষেপে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী প্রায় দুই দশক বাংলাদেশের জাতি রাষ্ট্র গঠনের পর্ব হলেও, এই জাতি রাষ্ট্র গঠনের পর্ব একদিনে শুরু হয়নি। শুরুর আগেও একটা শুরু থাকে। ১৯৪৭ এর পরবর্তী সময় থেকেই বাংলাদেশ জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াস চলেছিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হবার পর থেকে পূর্ব বাংলার জনমানসে ক্ষোভ-বিক্ষোভের জন্ম নিচ্ছিল। আর এই ক্ষোভের জন্ম হল ভাষাকে কেন্দ্র করে। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের কর্ণধার মহম্মদ আলি জিন্নাহ পূর্ব পাকিস্তানে এলেন এবং ঢাকার রমনা ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করলেন একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তাঁর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। তাঁদের দাবী একমাত্র বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। কারণ এই ভাষার সঙ্গে আছে পূর্ব বাংলার নাড়ীর যোগ। এই "ভাষার দাবীতে এই গণ আন্দোলন সারা পূর্ববাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের এই আন্দোলন 'সেপ্টেম্বর আন্দোলন' নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন শেখ মুজিবর রহমান, মিসেস আনোয়ারা খাতুন, খয়রাত হোসেন, মোহাম্মদ আলী, ডাক্তার এ এম মালেক, তোফাজ্জল আলী প্রমুখেরা।"[১] এই ভাষা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং এর প্রবল প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারি-তে এসে। সরকারপক্ষ ১৪৪ ধারা জারি করল। ২১শে ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার, ৮ই ফাল্গুন) সকালে আর্টস বিল্ডিং-এর আমতলায় ১৪৪ ধারা ভাঙতে গেলেই পুলিশ গুলি চালায়। ভাষা আন্দোলনে শহীদ হন রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম। শহীদের রক্তে বাংলা ভাষা তাঁর মর্যাদা ফিরে পায়। এর আগে কোনো ভাষার জন্য আত্মদান পৃথিবীর ইতিহাসে কোনদিন ঘটেনি। রাষ্ট্র বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার সম্মান দিতে বাধ্য হয়।

ওই দিন থেকেই বাংলাদেশ গঠনের জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধও শুরু হয়ে যায়। এর প্রতিফল হিসাবে ১৯৫৪ এর সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পতন ঘটে, জয় হয় যুক্তফ্রন্টের। কিন্তু বাংলাদেশের পরিস্থিতি শান্ত হল না। সরকার বিরোধী আন্দোলন জোরদার হতে থাকল এবং স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের দাবীতে বিক্ষোভ-আন্দোলন চরম আকার ধারণ করল। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হয়। ১৯৬২ সালে এসে ছাত্রদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। মানুষ ভাষা-সংস্কৃতি-স্বাধীনতার জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠে। সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করে। সরকারপক্ষও আন্দোলন দমন করার জন্য শত শত আন্দোলনকারী ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতাদের কারাবাসে পাঠায়, গণমাধ্যমের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ১৯৬৬ তে আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহমান ৬ দফা দাবি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬৮ তে শেখ মুজিবর রহমান, কিছু বাঙালি সাধারণ মানুষ এবং সেনাসদ্যসের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা হয়। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র কমিটি তাদের ১১ দফা

আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৯ এ এই আন্দোলন চরম রূপ নেয়। ইউনিভার্সিটির ছাত্র আসাদ, নবকুমার স্কুলের ছাত্র মতিউর রহমান এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শামসুদ্দোহা শহীদ হন। আন্দোলনের মুখে জেনারেল আয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে যায়। ১৯৭০ এ চরম চাপের মুখে ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেন। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পায়, যা সমগ্র পাকিস্তানের সর্বমোট ৩০০ আসনের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তৎকালীন সামরিক সরকার এই ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ১৯৭১ এর ১লা মার্চ পাকিস্তানের সামরিক সরকার নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন স্থগিত করে দেয়। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবর রহমান ঐতিহাসিক এক ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং বলেন "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ২৫শে মার্চের মধ্য রাত্রি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু করে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বল্প সময়ে সবচেয়ে ভয়ংকর গণহত্যা।[২] অবশেষে –

> "১৯৭১ সালে ন'মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধে অসংখ্য মানুষের প্রাণের বিনিময়ে সহযোগী মিত্রশক্তি ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সহযোগিতায় ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন গণজনতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য মুজিবর রহমান যে-কদিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তিনি একদিকে যেসব আইনশৃঙ্খলার শাসন প্রতিষ্ঠা, বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্নির্মাণ, সর্বস্ব খোয়ানো বিপুল সংখ্যক মানুষের পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তেমনি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করে, শিশু গণতন্ত্রকে হত্যা করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা হস্তগত করে। প্রথমে খোন্দকার মোশতাক আহমদ (২০ আগস্ট থেকে ৬ নভেম্বর ১৯৭৫) পরে জিয়ায়ুর রহমান (১৯৭৫-৮১) এবং শেষে হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। এর পরের ইতিহাস গড়ে উঠেছে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে।"[৩]

অর্থাৎ ১৯৭০-এর পরবর্তী সময়ের বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ১৯৭১ এর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হলেও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বাংলাদেশকে সুস্থির থাকতে দেয়নি। বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান ঢাকায় তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে নিহত হবার পর বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ফের টাল খেয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর শাসনকাল বাংলাদেশের যে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছিল, অচিরেই তার বিনাশ ঘটে। মৌলবাদী বি.এন.পি পার্টি ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা চরমে ওঠে। যে আশা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছিল, সেই আশা দ্রুত নিরাশায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের জনগণের কাছেও স্বাধীনতা একটা প্রহসনে দাঁড়িয়ে যায়। মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের অবক্ষয়, হতাশা, ক্ষোভ বাড়তে থাকে। কিছু না পাওয়ার বেদনা সাধারণ জনগণকে কুরে কুরে খেতে থাকে। বিদেশি শক্তি ও রাষ্ট্র শক্তির সাহায্য নিয়ে সমাজের একশ্রেণীর মানুষ যেমন অর্থনৈতিক দিক থেকে ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, তেমনি তাদের মধ্যে দেখা দিল সাংস্কৃতিক অবক্ষয়। সমাজের ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট ভাবে দেখা দিল। বিলোপ ঘটতে থাকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভাঙন শুরু হল। মৌলবাদের কালো থাবা গ্রাস করল সমাজের সর্বস্তরকে। বারবার সামরিক শাসন ও অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের মানুষকে স্বস্তি বা শান্তি কিছুই দিতে পারল না। মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ল এই অস্থিত পরিস্থিতিতে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ছোটগল্প সমসাময়িক সমাজ-অস্থিরতার চিত্র তুলে ধরছে।

বিশ শতকের আটের দশকের ছোটগল্পের আলোচনার প্রসঙ্গে নাসরীন জাহান তাঁর সম্পাদিত 'বাংলাদেশের গল্প: আশির দশক' গ্রন্থের ভূমিকায় এই দশকের গল্পের বিশেষতা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন, "ঠিক সে সময় পোষমানা, পরিচিত, নিরাপদ মায়াময় বৃত্তটিকে ভেঙ্গে ছোটগল্পে নতুন তরঙ্গের অনুভব এনেছে বিশেষ করে লিটল ম্যাগাজিন কেন্দ্রিক তরুণ কিছু গল্পকার। তাঁদের লেখায় ছোটগল্পের ছিমছাম তনুখানি অনুপস্থিত। পূর্বসূরীদের জনপ্রিয়তার ধাঁধায় অস্থির হয়ে আশির কোন গল্পকারই নিজেকে সেই ধারায় বিকশিত করেন নি। তেমন ধারায় নিজেকে প্রবাহিত করার প্রতিভাও(?) সম্ভবত আশিতে অনুপস্থিত। সাম্প্রতিক মানুষকে তুলে ধরার তাগিদে নিটোল গল্প ঝেড়ে তাঁরা তৈরি করেছেন নানা সংকটের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত ছোটগল্পের খরখরে শরীর। নিরীক্ষাপ্রবণতা আশির গল্পকারদের

মধ্যেই সবচে বেশি পরিলক্ষিত হয়।"[৪] এছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্রকে ভাষা দিয়ে ধরার একটা চেষ্টা চলতে থাকে। পাশাপাশি বাংলাদেশের ছোটগল্পের মধ্যে প্রতীকী-ব্যঞ্জনারও প্রকাশ ঘটে, গল্পের ফর্ম ও রূপও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বদল হয়। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট ও সমস্যার চিত্রগুলির পাশাপাশি বাংলার গ্রামীণ জীবন সমস্যার কথাও উঠে আসছে ছোটগল্পে। এতদিন পর্যন্ত যে বাংলাদেশের ছোটগল্পে শুধু অন্যায় ও অত্যাচারের দিকটিকেই তুলে ধরা হচ্ছিল, কিন্তু এবার দেখা গেল মার খাওয়া মানুষকে ঘুরে দাঁড়াতে, প্রতিবাদী চরিত্রের উদ্ভব ঘটল ছোটগল্পে। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ের একটা বড় প্রতিফলন ছোটগল্পের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল।

এই অস্থিত সময়ে দাঁড়িয়ে সমসাময়িক যে সমস্ত গল্পকারদের ছোটগল্পে সমকালীন যুগবাস্তবতা উঠে আসছে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – সেলিম মোরশেদ, মামুন হুসাইন, পারভেজ হোসেন, শহিদুল আলম, শহিদুল জহির, কাজল শাহ্‌নেওয়াজ, সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, তারেক শাহরিয়ার, অশোক কর, মাখরাজ খান, শামসুল কবীর, প্রলয় দেব, সঞ্জীব চৌধুরী, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, ওহায়িদা রেজা, মহিবুল আজিজ, ওয়াসি আহমেদ, ইমতিয়ার শামীম, ঝর্না রহমান, নাসরীন জাহান, মনীশ রায়, মোস্তাফা হুসেইন, হামিদ কায়সার, হুমায়ুন মালিক প্রমুখ গল্পকার। এঁদের মধ্যে যেমন অনেক নবীন গল্পলেখক আছেন, তেমনি প্রবীন লেখকেরাও আটের দশককে তাঁদের ছোটগল্পে সমকালীন চিত্রকে তুলে আনছেন।

এই গবেষণা নিবন্ধের স্বল্প পরিসরের মধ্যে নির্বাচিত কয়েকজন গল্পকারের গল্প নির্বাচন করে তার মধ্যে বিষয়টিকে বোঝার চেষ্টা করা হবে। এক্ষেত্রে গল্পকারদের সময়কাল এবং গল্প রচনা বা প্রকাশের সময়কালের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গল্পের মধ্যে প্রবাহিত সময়। সমসময়ের যুগযন্ত্রণার চিত্র উপস্থিত এমন গল্পকেই নির্বাচিত করা হয়েছে, যেখানে সমসাময়িক সমাজ-অস্থিরতা ও দ্রোহভাবনার পরিচয় পাওয়া যাবে।

এই দশকের এমনই একজন বলিষ্ঠ গল্পলেখক পারভেজ হোসেন। ছোটকাগজকেন্দ্রিক গল্প লেখক হলেও তাঁর গদ্যের ভাষা যেমন সংযমী, তেমনি রিয়ালিস্টিক ধারায় সংহত বর্ণনার ক্ষেত্রে দক্ষতা অসাধারণ। যেমন তাঁর 'ক্ষয়িত রক্তপুতুল' গল্পটি বাবা জোনায়েদ ও তার যুবতী মেয়ে বিন্তির যাপনের গল্প, সম্পর্কের গল্প। এই সম্পর্ক সহজ এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিকতার আধারে আবর্তিত। কিন্তু গল্পের প্রথমেই লেখক অন্ধকারের বর্ণনা দিচ্ছেন। "লোডশেডিং-এ পুরো এলাকাটা কবরের অন্ধকারে চোবানো।"[৫] এই অন্ধকারের প্রতিফলিত জোনায়েদের শারীরিক অবস্থা "সমস্ত শরীর জবজবে ন্যাতানো। মুখমণ্ডল পান্ডুর অথচ কঠিন। চোখগুলো মরা মাছের শীতলতায় পাখির।"[৬] আর মানসিক অবস্থা "কোন শব্দ নেই। মানুষ জন নেই। দূর থেকে শুধু গোটা দুই কুকুরের ভয়াল কান্না ঢেউ তুলে যাচ্ছে সমস্ত স্তব্ধতায় এবং জোনায়েদের হৃৎপিন্ডে – এরকম একটা স্বপ্নভঙ্গের পর গায়ে চাদর জড়িয়ে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও ভাবছিল – আর কি কি দেখেছে সে। কিছুই মনে আসছে না, শুধু পরিবেশের অস্পষ্ট ছবি, কুকুর কান্না আর বুক ধড়ফড়।"[৭] এই স্বপ্নভঙ্গ কি স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গকে লেখক বোঝাতে চাইছেন? আর কুকুরের কান্না সমসাময়িক যুগযন্ত্রণার কান্না? এই উত্তর স্পষ্ট না হলেও বোঝা যায় এই রূপকের মধ্যে দিয়ে লেখক সমসাময়িক সময়ের অস্থিরতাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। অন্ধকার এখানেই শেষ হয় না, এই 'অন্ধকার'-এর চিত্র গল্পের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে। পাশের ঘরে এই অন্ধকার জোনায়েদের মেয়ে বিন্তির অন্তকরণে হানা দেয়, "ভয়, আবারও ভয় বিন্তির। বুকের রক্ত দই হয়ে গেছে ওর মুহূর্তে। দু'কান দিয়ে সোঁদা সোঁদা ভাপ বেরুচ্ছে। হাত পায়ের আঙ্গুলের ডগাগুলো হিম। শুকনো গলায় পানি ঢালতে ইচ্ছে হয় ওর..."[৮] কিন্তু বিন্তির মনের অন্ধকার পাঠককে অন্য ইঙ্গিত দেয়। বাবা জোনায়েদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা পরিষ্কার হয় না। গল্পকার সম্ভবত ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অবতারণা করেছেন এখানে। অন্ধকার ঘরে শুয়ে বিন্তির মনে হয় একটা গরম হাত তার সমস্ত শরীর বেয়ে উঠে এসে কপাল স্পর্শ করে চলে যায়, আর সে স্পর্শটা মানুষের স্পর্শ; তাই বিন্তির মনে হয়, "তবে বাবা, বাবাই কি উঠে এসে..."।[৯] অনেক পুরনো কষ্টকর স্মৃতি বিন্তিকে মোচড়াতে থাকে, "মাথার মধ্যে কীটের কিলবিল – বাবা কাছে ডেকে আদর করেছিলেন; যদিও হালকা একটা চুমু ওর ঠোঁটে ছুঁইয়ে ঘাড় থেকে এলোমেলো চুলগুলো বাঁ হাতের আঙ্গুলে পিঠের দিকে সরিয়ে দিয়েছিলেন আলতো করে কিন্তু তার নাক দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল গভির গরম নিঃশ্বাস। শরীরের সমস্ত কোষগুলো জেগে উঠলে যে বাতাস নাকমুখ

দিয়ে বেরোতে পারে তাই।"[১০] লোডশেডিং কেটে ইলেকট্রিসিটি চলে এলে বিন্তি ও জোনায়েদের সম্পর্কের জটিলতাও কিছুটা খুলে যায়। বিন্তির মনে হতে থাকে তাকে আবার তার "বাবা কথা বলুক অনর্গল, যা খুশি বলুক বাবা। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করুক, ঘুম পাড়িয়ে দিকনা ছোটবেলার মতো গল্প বলতে বলতে; একটা নয় দুটো নয়, অনেকগুলো, অনেকক্ষণ, যতক্ষণ ঘুম না আসে।"[১১] আবার পরক্ষণেই বিন্তি মানসিক কষ্টে ভুগতে থাকে। তার বাবা কখনো কখনো তাকে আর তার মৃত মাকে আলাদা করতে পারে না।

> "চুলগুলো কেটে ছোট করেছিস বলেই দু'জনকে এভাবে আলাদা করা যায়। না হলে সব এক, হুবহু।"[১২]

গল্পকার আলো-আঁধারির আবর্তনে বাবা ও মেয়ে সম্পর্কের জটিলতা নির্ধারণ করেছেন। একদিকে বাৎসল্য রস ও অন্যদিকে কামনা। এই দুয়ের টানাপোড়েন যেমন বাবা ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে "রহস্যময় দোদুল্যমান দূরত্ব তৈরি"[১৩] করে, তেমনি পরস্পরকে বুঝতে না দেওয়ার চেষ্টার নিজেরাই মানসিক ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়। আর "বুকের মধ্যে চলমান চাকায় পিষ্ট হতে থাকে সম্পর্কের চিত্রের দলিল।"[১৪]

এই সময়েরই আর একজন অন্যতম গল্পকার সেলিম মোরশেদ। তিনি মূলত নিরীক্ষাপ্রবণ এবং নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজকে দেখেছেন। ফলে কর্কশ, রূঢ় জীবন বাস্তবতা তাঁর লেখনীতে ভিন্ন স্বরের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। গল্পের মধ্যে তিনি প্রতীক ও রূপকের অবতারণা করে গল্পকে যেমন অন্য মাত্রা দান করেন, তেমনি প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও তাঁর গল্পের মধ্যে রূপকায়িত ভাবে প্রকাশিত হয়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'কাটা সাপের মুণ্ডু' গল্পটির কথা বলা যায়। মূল চরিত্রের নাম হেমাংগিনী। গল্পটি একটি প্রতিবন্ধী যুবতী ভিখারীনি গল্প।

> "বাম ঠ্যাং ব্যাকা। মিহি করে আঙুলগুলো কাটা থাকায় সে ঠ্যাং-এর পাতা খড়মের কাঠ। হেমাংগিনী পেটে থাকতে তার মাবটি দিয়ে ঢ্যাড়স টুকরো করে আগুনে সিদ্ধ করে খেয়েছিলো, তাই ৫টা আঙুল সে সময় পেটের ভিতর গলে গেলো। হেমাংগিনীর মা দুঃখে কথাটা বলেছিলো মরার আগে। ডান হাত কি করে নুলো হল হেমাংগিনী টের পেলো না।"[১৫]

এই হেমাংগিনীর বাসস্থান পুরনো জংশনের পিছনে এক খুপরিতে। যেখানে আর রেল চলে না। এই বস্তিতে বেশিরভাগই "কৃশ, রোগাক্রান্ত, আপোষকামী অনাথ মানুষ। এখানে আলো নেই, অন্ধকার প্রকট, বিড়ির আগুনে রাতের অন্ধকার গোমেদ-কালচে হিম।"[১৬] স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা এইভাবেই গল্পকারের কলমে উঠে আসে। সমকালীন সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থাটিও এই গল্পে পরিলক্ষিত হয় হেমাংগিনীর আয় ও সংসারের অবস্থা বর্ণনায়। "সারাদিন আয় তার ৩০ পয়সা। সকালে পয়সাগুলো দিয়ে একটা রুটির অর্ধেক খেয়েছে ইটের হোটেল থেকে। আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে ৬০ পয়সা আটার একটা রুটি কিনে হেমাংগিনী আর সে লোক খেয়েছে। পলকে অর্ধেক রুটি পেটের ভেতর মিশে যাওয়ায় হেমাংগিনী রেগে গেছে তখন থেকে। খুপরির ভেতর মাটির লেপা চুলোয় আগুনের নীলচে আঁচ রবীন্দ্রনাথকে পুড়িয়ে দিয়ে মরা হাড়ের অস্তিত্ব সারা খুপরিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। চুলোর পাশে কলস, তোবড়ানো মগ, হেমাংগিনীর ফুটো থালা, থালার কোণে কিছু লবণ – জং ধরা বটি আর হেমাংগিনীর সংসার।"[১৭] সমকালীন সময়ের কঠিন কঠোর রূঢ় অর্থনৈতিক বাস্তবতা এই গল্পে উঠে এসেছে। এই আধখানা রুটির অনুষঙ্গ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের 'হে মহাজীবন' কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে মনে হতে পারে। আর রবীন্দ্রনাথের অনুষঙ্গ হয়তো স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"-র পরিবর্তে রূপকায়িত ভাবে ফুটো থাকা ও জং ধরা বঁটির মধ্যে দিয়ে গল্পকার সমসাময়িক অস্থিত অন্ধকার সময়কে ব্যঙ্গের কশাঘাতে বিদ্ধ করেছেন। কারণ স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ তখন বাস্তব, রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা পুড়ে যাচ্ছে আর মরা হাড়ে সে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। হেমাংগিনী এই গল্পে একটি শ্রেণীচরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে উঠছে। শুধু নির্মম কর্কশ দারিদ্র্য নয়, এই দরিদ্রতা থেকে নিজের মত করে প্রতিহিংসার মাধ্যমে প্রতিবাদীও হয়ে আশাবাদেরও উত্তরণ দেখিয়েছেন গল্পকার। তাই হেমাংগিনী ৫ হাত লম্বা আর ৪ হাত উচ্চতার খুপরির যেখানে "ঘামে চপচপে সভ্য মানুষের মোজার নিংড়ানো গন্ধের"[১৮] মধ্যে মেঝেতে শুয়ে, "গোলপাতা গলিয়ে আকাশ দেখা যায়, নক্ষত্র-বিন্দু সূর্য হয়ে"[১৯] তার চোখের মধ্যে জ্বলতে থাকে, আর সে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে। এমন সময়ে গোলপাতার ভেতর থেকে চর্বিযুক্ত একটা পেটি তার দৃশ্যগোচর হয়, আস্তে আস্তে পুরো সাপটাই সে দেখতে

পায়। আর এমন সময়েই তার মনে পরে যায় তার মায়ের কথা। যে নাকি গোপনে শরীর বেচতো। আর তার বিগতযৌবনা "মাদী কুকুরের মতো মায়ের ঊরুসন্ধিতে টকটকে লাল জরায়ু বেরিয়ে পড়ে যোনিমুখে ঝুলে গেলো তামাম দুনিয়ার মতো, - তখন ক্ষুধা, কি ক্ষুধা!"[২০] আর ক্ষুধার জ্বালায় তার মা দু'গ্রাম পেরিয়ে কোনো জলা জায়গা থেকে আনতো আঁচলে করে কলমি শাক আর দু'একটা তেলো টাকি চ্যাং মাছ। "গরম ভাতের উপর জ্যান্ত চ্যাঙ-এর পেটি। উল্লাস। ওহো সেকি উল্লাস!"[২১] সাপ তার মনে ভয় ধরালেও সে লোভাতুর দৃষ্টি সাপের পেটির দিকে তাকিয়ে থাকে। একটানে সাপটি ধরে উনুনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। সাপ পোড়া গন্ধে সবাই উদগ্রীব থাকলেও "পোড়া কাঁচকলার মতো সিদ্ধ সাপ হেমাংগিনী পেট পুরে নির্বিকার ভাবলো – ভয়ঙ্কর সাহসী হলেই খেতে পাওয়া যায়।"[২২] সাপটি ছিল শঙ্খচূড় প্রজাতির। এই প্রজাতির বিষাক্ত সাপের দ্যোতকে লেখক বোধহয় সমসাময়িক স্বৈরাচারী শাসকের দিকেই আঙুল তুলতে চেয়েছেন। আর হেমাংগিনীর মত শ্রেণীপ্রতিনিধি সেই সাপের শেষ অংশটুকু পর্যন্ত "দাঁতে কেটে গালে লবণ ছিটিয়ে, অতি ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে খেলো।"[২৩] আর তারপর "কাটা মুণ্ডুটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ঠাণ্ডা মাটিতে, বহুদিন পর ঘুমুতে চাইলো পরম নিশিন্তে। ..."[২৪]

এই দশকেরই আর একজন শক্তিমান গল্পকার হুমায়ুন মালিক। তাঁর 'দিকদর্শনহীন' গল্পটি একদিকে সমসাময়িক সমাজের নগ্নরূপ যেমন প্রকাশিত হয় তেমনি গল্পের মধ্যে দিয়ে তারুন্যের দ্রোহ ও প্রতিবাদের স্বরও ধ্বনিত হয়ে গল্পটি আশাবাদে উত্তীর্ণ হয়। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র মোহনলাল, পেশায় লাশকাটা ঘরের ডোম। গল্পটির শুরুতেই জীবনানন্দ দাশের লাশকাটা ঘরের কবিতা বলে পরিচিত 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। "অজস্র মানুষের রক্তমাখা বিবর্ণ টেবিলে মেয়েটি শুয়ে আছে।"[২৫] অর্থাৎ একটি লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য লাশঘরে এসেছে, সেটি একটি সুন্দরী যুবতী নারীর। "অসহ্য সুন্দর মুখ ভয়াল পরিবেশে স্থির।"[২৬] আর এই পরিস্থিতিতে হাতের কাছে পোস্টমর্টেমের সমস্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মোহনলাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই অবস্থা সমকালীন সমাজের অব্যবস্থার চিত্রকেই তুলে ধরে, -

> "ক্রমশ নিজের ভেতর এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি অনুভব করে সে।"[২৭]

গল্পে উল্লেখিত লাশকাটা ঘরে বিভিন্ন ধরনের লাশের বর্ণনাই সমসাময়িক সমাজ-অস্থিরতাকে চিহ্নিত করে। নানান ধরনের মানুষ নানান পরিস্থিতিতে লাশ হয়ে চলে আসে চিৎ হয়ে টেবিলের উপর শুতে।

> "রোজ কত লাশ আসে। লোকজন দেখেও দেখে না, জেনেও জানে না। আজকাল কী পরিমাণ অস্বাভাবিক (বন্যা খরা দুর্ভিক্ষ বাদেই) মৃত্যু হচ্ছে। যেন এসবও মৃত্যুর এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কুকুর ছুঁচোর চেয়েও মানুষ তুচ্ছ। সামান্য স্বার্থেই মানুষ জবাই করে। খুন, ধর্ষণ, কতো রকমের দুর্ঘটনায় লাশের পর লাশ এসে জমা হচ্ছে মর্গে। উদয়াস্ত লাশ কাটো। লাশ আর লাশ।"[২৮]

এত লাশের জমা হওয়া ও বর্ণনা সমকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক অরাজকতাকেই তুলে ধরে। আর এই এত লাশের "প্রায় সবই ওই সর্বহারা শ্রেণীর। নির্যাতিত বিষ খেয়ে মরা পোয়াতি। ভাতাবানে গলায় দড়ি দেওয়া নারী-পুরুষ। শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার। কতো বেওয়ারিশ লাস।"[২৯] কিন্তু এত লাশের মধ্যে এই মেয়েটিও হয়তো এমন কোন পরিস্থিতির শিকার। অনেক খুঁটিয়ে দেখেও মোহনলাল বুঝে উঠতে পারে না এই যুবতীর মৃত্যুর কারণ কী! অবশেষে সে চিনতে পারে যে এই মেয়েটিই সেই মেয়েটি,

> "উকিলপাড়ার যে মেয়ে ডাক্তারি পড়ে ক'দিন আগে ডোমপাড়ায় উলাওঠায় স্যালাইন, ইনজেকশন দিয়ে এলো, যাকে ও প্রায় রোজ দেখে, রোজ দেখতে চায় – এতো সে-ই। মুহূর্তের মধ্যে ভিন্ন মুখের আদল ফুটে ওঠে একই মুখে। স্টাফ কোয়ার্টারের যে মেয়ে সাংস্কৃতিক-গোষ্ঠী নিয়ে রাস্তায় গান গেয়ে বন্যার্তের জন্য চাঁদা তোলে তার সঙ্গেও যে হুবহু মেলে এর। আশ্চর্য, কাট-টু-কাট।"[৩০]

আসলে মোহনলাল মেয়েটিকে চিনতে পারে না, মেয়েটির মধ্যে দিয়ে গল্পকার এত মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও লাশের প্রতীকের দ্বারা পাঠকদেরকে জীবনকে চিনতে শেখান, আশাবাদের সুর শোনান। সেই জন্যই মোহনলালের মনে হয় "এক মুখেই অনেক মুখের খেলা।"[৩১] মোহনলালের চৈতন্যের জাগরণ ঘটান লেখক। তাই মেয়েটির সমগ্র শরীর তন্ন তন্ন খুঁজেও কিছু বুঝতে না পেরে মেয়েটির পায়ের কাছে যায়।

> "ধীরে ধীরে তার মাথা ঝুঁকে পড়ে। অবশেষে দিশাহীন এক মানব মাটির দেবীর চরণে মাথা ঠেকায়।"[৩২]

মোহনলালের এই দিশাহীনতা সমগ্র সমাজের দিশাহীনতা। নিপীড়িত, বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষের দিশাহীনতা। এই শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করতে চায় মোহনলাল।

> "যখন মেয়েটি উলাওঠা ডোমপাড়ায় সেলাইন ইনজেকশন দেয়, বন্যা-প্লাবিত গ্রামে রুটি বীজধান বিলায় তখন মনে হয়েছিলো পৃথিবীর সব দুর্যোগ আর অনাচারে ওইসব মানুষের পাশে সে থাকবে। কিন্তু কী আশ্চর্য সেই মেয়ে এখন তার টেবিলে।"[৩৩]

আসলে গল্পকার রূপকের মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন এই লাশ কোনো মেয়ের লাশ নয়, দেশমাতৃকার লাশ। তাই মোহনলালকে দিয়ে 'মাটির দেবী' অর্থাৎ দেশমাতার চরণে প্রণাম জানায়। যে দেশমাতা রক্তাক্ত, ধর্ষিত, অত্যাচারিত শাসকের হাতে। যেটা বাংলাদেশ সমসাময়িক চিত্রকেই ফুটিয়ে তোলে। আর নিপীড়িত শ্রেণীর প্রতিনিধি মোহনলালের "বুকের মধ্যে আগুন আছে, চাপা আগুন। কিন্তু কী দাম সে আগুনের, যদি তা কোনো পথ পেয়ে জ্বলে না ওঠে, জ্বালায়।"[৩৪] মোহনলাল তার সীমিত বুদ্ধিতে এর প্রতিবিধান করতে ডাক্তার, পুলিশ, সাহেব সবার কাছে যাবার জন্য বেরিয়ে যেতে চাইলে ওই শায়িত মৃত লাশের নারীকণ্ঠ বলে ওঠে, "আমার সমস্ত শরীরে কতো অপঘাত, অপব্যবহারের চিহ্ন। আশ্চর্য। তুমি তার কিছুই দেখলে না।"[৩৫] মেয়েটি মোহনলালকে নিজেকে উদ্ধারের কথা বলতে গেলেই বাইরে থেকে ক'জন ঢুকে গিয়ে মোহনলালকে আদেশ করে মেয়েটির শরীর থেকে ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, পাকস্থলী সব আলাদা করতে। আর তারপর তারা সেই সোনার বরণ লাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও একে একে চারজন সেই লাশকে ধর্ষণ করে। মোহনলাল বাধা দিয়েও প্রতিপক্ষের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। তাকে আধমরা করে বেঁধে রেখে যখন প্রতিপক্ষের লিডার নদীর জলে ভাসিয়ে দেবার পরিকল্পনা করে, তখন -

> "মোহনলালেরও আশা জাগে। তখন যদি কোনোভাবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, যেখানে গিয়ে ভাসবে – যে পাড়ে, সে সেখান থেকে মোহনলালের নতুন যাত্রা।"[৩৬]

পরিশেষে বলা যেতে পারে, বিশ শতকের আটের দশকের বেশিরভাগ সময়ই নানান প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, নিপীড়ন, লুণ্ঠন সমাজে ও দেশে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছিল। আর সেই সময়ের গল্পকাররা বেশিরভাগই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে সেই অচলাবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন নিজেদের মত করে। কখনো সেটা সাহিত্যের মাধ্যমে আবার কখনো মাঠে বা রাস্তায় নেমে। ফলে ওই সময়ের ছোটগল্প যেমন নিরীক্ষাপ্রবণ হইয়েছে, তেমনি তার মধ্যে উঠে এসেছে গভীর জীবনবোধ, সামাজিক অন্তঃসারশূন্যতা এবং মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাত যা সূক্ষ্ম শিল্পমণ্ডিত শক্তির সঙ্গে বিকাশ লাভ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. ইসলাম, মোজহারুল, আমি স্মৃতি আমি ইতিহাস, ঢাকা, বুক সোসাইটি, ১৯৮৭, পৃ. ৫২০
২. লোকালটক (সম্পা.), ফিরে দেখা ৭১ (ইন্টারনেট সংস্করণ), ২০০৮ খ্রিঃ, পৃ. ৩৫-৩৬
৩. রায়, অলোক, বিশ শতক, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী, ২০১০ খ্রিঃ, পৃ. ১৩
৪. জাহান, নাসরীন (সম্পা.), বাংলাদেশের গল্প, আশির দশক, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১০
৫. হোসেন, পারভেজ, ক্ষয়িত রক্তপুতুল, বাংলাদেশের গল্প, আশির দশক, নাসরীন জাহান (সম্পা.), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৯৩
৬. তদেব, পৃ. ৯৩
৭. তদেব, পৃ. ৯৩
৮. তদেব, পৃ. ৯৩
৯. তদেব, পৃ. ৯৪

১০. তদেব, পৃ. ৯৪
১১. তদেব, পৃ. ৯৬
১২. তদেব, পৃ. ৯৪
১৩. তদেব, পৃ. ৯৫
১৪. তদেব, পৃ. ৯৮
১৫. মোরশেদ, সেলিম, কাটা সাপের মুণ্ডু, বাংলাদেশের গল্প, আশির দশক, নাসরীন জাহান (সম্পা.), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৪৩
১৬. তদেব, পৃ. ২৪৪
১৭. তদেব, পৃ. ২৪৪
১৮. তদেব, পৃ. ২৪৫
১৯. তদেব, পৃ. ২৪৫
২০. তদেব, পৃ. ২৪৫
২১. তদেব, পৃ. ২৪৬
২২. তদেব, পৃ. ২৪৭
২৩. তদেব, পৃ. ২৪৭
২৪. তদেব, পৃ. ২৪৭
২৫. মালিক, হুমায়ুন, দিকদর্শনহীন, বাংলাদেশের গল্প, আশির দশক, নাসরীন জাহান (সম্পা.), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৬৪
২৬. তদেব, পৃ. ২৬৪
২৭. তদেব, পৃ. ২৬৪
২৮. তদেব, পৃ. ২৬৮
২৯. তদেব, পৃ. ২৬৮
৩০. তদেব, পৃ. ২৬৬
৩১. তদেব, পৃ. ২৬৬
৩২. তদেব, পৃ. ২৭০
৩৩. তদেব, পৃ. ২৬৬
৩৪. তদেব, পৃ. ২৭১
৩৫. তদেব, পৃ. ২৭১
৩৬. তদেব, পৃ. ২৭৫